Vol. 53 | No. 2 | 2016

Check for updates

সাহিত্য পত্রিকা

journal.bangla.du.ac.bd

অমৃতলাল বসুর প্রহসন : সমাজবাস্তবতার রূপচিত্র

Volume	53
Issue	2
Year	2016
ISSN	0558-1583
eISSN	3006-886X
Author(s)	Mir Humayun Kabir
Published online	February 1, 2016
DOI	10.62328/sp.v53i2.8
Link to article	https://doi.org/10.62328/sp.v53i2.8
Pages	১১৫-১৩২
Publisher	University of Dhaka
Copyright	সাহিত্য পত্রিকা
Designed and Developed by	Zobayer Abdullah

Check for updates

অমৃতলাল বসুর প্রহসন : সমাজবাস্তবতার রূপচিত্র

মীর হুমায়ূন কবীর*

সার-সংক্ষেপ : বাংলা নাটকের বিকাশ পর্যায়ে যেসব নাট্যকার প্রত্যয়ী ভূমিকা পালন করেছেন তাঁদের অন্যতম অমৃতলাল বসু (১৮৫৩-১৯২৯)। নট-নাট্যকার ও মঞ্চাধ্যক্ষ হিসেবেই তাঁর খ্যাতি ও প্রতিষ্ঠা। হাস্যরসাত্মক প্রহসন রচনার জন্য সমকালে তিনি 'রসবাজ' আখ্যা পান। উনিশশতকের সমাজ পরিসরে বিদ্যমান বিবিধ অসঙ্গতি তাঁর প্রহসনে ব্যঙ্গাশ্রয়ে উপস্থাপিত হয়েছে। এ-সময় পাশ্চাত্য শিক্ষার অন্ধ অনুকারী একশ্রেণির বিপথগামী বাঙালি তরুণ জাতিগত স্বকীয়তা এবং আবহমান প্রচলিত সাংস্কৃতিক ঐতিহ্য ও আত্মমর্যাদাবোধ বিসর্জন দিয়ে বহ্নিমুখ পতঙ্গের মতো ধাবিত হয় আত্মবিনাশী পরিণতির দিকে। নব-উদ্ভূত 'বাবু' শ্রেণির দৌরাত্ম্যে কল্লোলীয় কলকাতার সমাজ কিংবা পরিবার পরিসরে যে নৈরাজ্যকর বিকৃতি সর্বগ্রাসী রূপে আবির্ভূত হয় তারই শিল্পরূপায়ণ ঘটেছে অমৃতলাল বসুর প্রহসনে। প্রহসন রচনায় তিনি মাইকেল মধুসূদন দত্ত ও দীনবন্ধু মিত্রের সার্থক উত্তরসূরি। প্রহসনকার হিসেবে তাঁর কৃতিত্ব নিরূপণের জন্য বর্তমান প্রবন্ধে আলোচিত হয়েছে তিনটি প্রহসন: *বিবাহ-বিভ্রাট* (১৮৮৪), *বাবু* (১৮৯৪) এবং *বৌমা* (১৮৯৭)।

বাংলা নাটকের ধারায় অমৃতলাল বসু (১৮৫৩-১৯২৯) স্মরণীয় ব্যক্তিত্ব। তিনি ছিলেন একাধারে নট, নাট্যকার, কবি, গল্পকার, ঔপন্যাসিক এবং সংগঠক। বিশেষত বাংলা রঙ্গমঞ্চের অন্যতম প্রতিষ্ঠাতা এবং সংস্কারক তিনি। সাধারণ রঙ্গালয়ে (১৮৭২) অভিনীত প্রথম নাটক *নীল-দর্পণে* (১৮৬০) অভিনয়ের মাধ্যমে নাট্যাঙ্গনে তাঁর প্রদীপ্ত আবির্ভাব। সমকালে যে সকল অভিনেতা নাট্যাচার্য গিরিশচন্দ্র ঘোষের (১৮৪৪-১৯১২) সান্নিধ্য লাভের মাধ্যমে নিজেদের সমৃদ্ধ করেছেন, তাঁদের মধ্যে অমৃতলাল বসু অন্যতম। তবে গিরিশচন্দ্রের অনুসারী হলেও কাহিনি উপস্থাপনে তিনি অবলম্বন করেছেন স্বতন্ত্র রচনাকৌশল। 'গিরিশচন্দ্রের ভাবনিষ্ঠ, তত্ত্বসন্ধানী দৃষ্টি জীবনের গূঢ় এবং গভীর বিষয়ে নিবিষ্ট থাকিত। কিন্তু তরল ও হালকা জীবনের বিপর্যয় এবং বিকৃতির দিকেই অমৃতলালের তীক্ষ্ণ এবং বক্র দৃষ্টি নিবদ্ধ ছিল।' (অজিত ঘোষ ২০১০ : ১৮৬) বিচিত্রমুখী প্রতিভার অধিকারী এ শিল্পীকে কোনো কোনো গবেষক সমকালের শ্রেষ্ঠ নাট্যকার হিসেবে স্বীকৃতি প্রদান করেছেন। মহামহোপাধ্যায় হরপ্রসাদ শাস্ত্রীর (১৮৫৩-১৯৩১) মতে–

* সহকারী অধ্যাপক, পাবনা বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়, পাবনা

> আমার মনে হয় আমাদের দেশে যে সকল প্রতিভাশালী লেখক জন্মিয়াছেন তাঁহাদের মধ্যে শ্রীযুক্ত অমৃতলাল বসু মহাশয় সর্বশ্রেষ্ঠ। তিনি যত বই লিখিয়াছেন, যতদিন বঙ্গভাষা টিকিবে ততদিন সবগুলি টিকিবে কিনা বলিতে পারি না, তবে অনেকগুলি টিকিবে সেটি নিশ্চয়...আশ্চর্য অমৃত-বাবুর ক্ষমতা। (অরুণ ১৯৭০ : ১২০)

অকৃত্রিম বাঙালিয়ানা অমৃতলালের ব্যক্তি ও শিল্পী চরিত্রের প্রধানতম বৈশিষ্ট্য। তিনি শুধু তাঁর সাহিত্যকর্মের ভেতর দিয়ে স্বজাতিকে এ মন্ত্রে দীক্ষিত করেছেন তা নয়; তিনি স্বয়ং অংশগ্রহণ করেছেন সক্রিয় রাজনৈতিক কার্যক্রমে। বঙ্গভঙ্গ আন্দোলনের (১৯০৫) সময় হিন্দু জনগোষ্ঠীকে সংগঠিত করতে তিনি সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের (১৮৪৮-১৯২৫) সহযোগীরূপে নানা জায়গায় বক্তৃতা করেছেন, গান রচনা করেছেন। সঙ্গত কারণেই অমৃতলাল বসু শাসকশ্রেণির কোপদৃষ্টিতে পড়েছেন বারবার। বাঙালি, বাংলাদেশ এবং বাংলা ভাষার সঙ্গে তাঁর সম্পর্ক অবিচ্ছেদ্য। এক ভাষণে তিনি বলেছেন :

> আমার বাংলা ভাষাকে আমি বড় ভালবাসি, সকল বাঙ্গালীই বাসেন, কিন্তু আমি যেন বড্ড ভালবাসি; আমার ভাষাকে আমার চেয়ে আর কেউ বেশী ভালবাসেন, একথা মনে হলে আমার যেন একটু ঈর্ষা, একটু গায়ের জ্বালা হয়। শুধু বাংলা ভাষাকে কেন, আমি বাংলা দেশকেই ভালবাসি, বাঙ্গালীকেই ভালবাসি। আমি ভারতবাসী হতে পারি, কিন্তু Indian নই, আমি বাঙ্গালী। (অরুণ ১৯৭০ : ১৪২)

মূলত প্রহসন রচনার মাধ্যমে বিস্তৃত ও প্রতিষ্ঠিত হয় অমৃতলাল বসুর সাহিত্যিক সুখ্যাতি। কমেডির একটি বিশিষ্ট শ্রেণি Farce বা প্রহসন। সামাজিক জীবনে প্রচলিত নানা কুপ্রথা-কুসংস্কার এবং ব্যক্তিচরিত্রের নানা অপকীর্তি-অনাচার-ভণ্ডামিকে পরিহাস করে স্থূল হাস্যরসসৃষ্টি এ ধরনের নাট্যকর্মের মুখ্য উদ্দেশ্য। প্রহসনে কাহিনির কোনো সুসঙ্গত পরিণতি থাকে না; কাহিনিবয়নে প্রাধান্য পায় অতিরঞ্জিত কল্পনা ও উদ্ভট বিষয়াদি। চরিত্রের আকস্মিক আবির্ভাব ও অতি নাটকীয় আচরণ এখানে বিশেষভাবে পরিলক্ষিত হলেও চরিত্রসৃষ্টি লেখকের প্রধান লক্ষ্য নয় ; বরং 'প্রহসনে সমাজমানস গুরুত্ব পায় বেশি পরিমাণে – তবে সে গুরুত্ব শিল্পগত নয় ; হালকা রস-সঞ্জাত।' (সুবোধ : ৩০৩) শৈল্পিক বিবেচনায় এটি কমেডি অপেক্ষা দুর্বল হলেও জনপ্রিয় শিল্পমাধ্যম। গ্রিক নাট্যকার অ্যারিস্টোফেনিসের (খ্রিস্টপূর্ব ৪৪৫-৩৮৫) সময় থেকেই এ ধরনের নাট্যচর্চা প্রচলিত ছিল। তাঁর রচিত *দি ফ্রগস* (খ্রি.পূ. ৪০৫), *লিসিস্ট্র্যাটা* (খ্রি.পূ. ৪১১), *দি বার্ডস* (খ্রি.পূ. ৪১৪) প্রাচীন প্রহসনের কালজয়ী দৃষ্টান্ত। এছাড় ফরাসি নাট্যকার মলিয়ের (১৬২২–১৬৭৩) রচিত *Le Bourgeoisgentilhomme* (১৬৭০) ও *Le Misanthrop* (১৬৬৭), রিচার্ড শেরিডোনের (১৭৫১–১৮১৬) *The SchemingLieutenant* (১৭৭৫), ব্রানডন টমাসের (১৮৪৮–১৯১৪)) *Charley's Aunt Merry* (১৮৯২), উইলিয়াম শেক্সপিয়রের (১৫৬৪–১৬১৬) *Comedy o*

Errors (১৫৯৪) এবং *Wives of Windsor* (১৬০২) বিশ্বসাহিত্যের কালজয়ী প্রহসনের নিদর্শন।

বাংলা নাটকের উন্মেষলগ্নে যে কয়েকটি সামাজিক সমস্যামূলক নাটক রচিত হয়েছে তার অধিকাংশই প্রহসনধর্মী। এসময় বাংলা ভূখণ্ড নানারকম সামাজিক আন্দোলনে ছিল আলোড়িত। নবজাগ্রত শিক্ষিত শ্রেণি ও ব্রাহ্মসমাজের নেতৃবৃন্দ সমাজের নানা জরাজীর্ণ প্রথা যেমন : বহুবিবাহ, কৌলীন্যপ্রথা প্রভৃতির প্রবল বিরোধিতা করে এবং বিধবা-বিবাহ প্রবর্তন, নারী-পুরুষের সাম্য প্রতিষ্ঠা প্রভৃতি সমাজসংস্কারমূলক কর্মকাণ্ডে সচেষ্ট হয়। অন্যদিকে এসকল উদ্যোগের জোরালো প্রতিবাদ করে রক্ষণশীল সমাজ। ফলত প্রগতিবাদী ও প্রতিক্রিয়াপন্থীদের মধ্যে সৃষ্টি হয় অনিবার্য সংঘাত-উত্তেজনা। ভাবাদর্শগত এমন বিবিধদ্বন্দ্বক্ষুব্ধ ঘটনাচিত্র উপস্থাপিত হয়েছে তৎকালীন প্রহসনে। একটি বিষয় লক্ষণীয় যে, সমকালীন সামাজিক আন্দোলনের সঙ্গে প্রহসনকারদের নিবিড় সংযোগের কারণে নিরপেক্ষ দৃষ্টিকোণ থেকে শিল্পচর্চা তাঁদের পক্ষে অনেকাংশে সম্ভব ছিল না। সমাজরক্ষা এবং সমাজসংস্কারের প্রত্যক্ষ উদ্দেশ্য তাঁদের সাহিত্যকর্মের মধ্যে ছিল সুস্পষ্ট। বিশুদ্ধ প্রহসনকার হিসেবে বাংলা নাট্যসাহিত্যে মাইকেল মধুসূদন দত্তের (১৮২৪-১৮৭৩) নাম বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। পাশ্চাত্য সাহিত্যতত্ত্ব ও নাট্যরীতিতে অনুপ্রাণিত হয়ে তিনি রচনা করেন দুটি অবিস্মরণীয় প্রহসন : *একেই কি বলে সভ্যতা?* (১৮৬০) এবং *বুড়ো সালিকের ঘাড়ে রোঁ* (১৮৬০)। প্রথমটিতে ইংরেজি শিক্ষাভিমানী ইয়ং বেঙ্গলদের নানা উচ্ছৃঙ্খলতার চিত্র উন্মোচিত হয়েছে; দ্বিতীয়টিতে প্রদর্শিত হয়েছে ধর্ম-আচ্ছাদিত এক বৃদ্ধের গোপন লাম্পট্য ও বিকৃতি। দুটোই কথ্যবাংলায় স্বচ্ছন্দ ভঙ্গিতে রচিত। মধুসূদনের প্রহসনের আদর্শ ও প্রেরণায় দীনবন্ধু মিত্র রচনা করেন *সধবার একাদশী* (১৮৬৬), *বিয়ে পাগলা বুড়ো* (১৮৬৬) এবং *জামাই বারিক* (১৮৭২)। এই তিনটি প্রহসনেই সমকালীন সমাজের বিকৃতি, তার পাপ ও বিবেকবোধের যন্ত্রণাকে ভাষারূপ দিয়েছেন তিনি। *সধবার একাদশী*র ঘটনাংশ উন্মোচিত হয়েছে নকুলেশ্বর এবং নিমচাঁদের মদ্যপানকে কেন্দ্র করে। সমকালীন ইয়ং বেঙ্গলদের এরূপ চিত্রণে 'দীনবন্ধু তাঁহার পূর্বসূরি মধুসূদনের দ্বারা প্রভাবিত হয়েছিলেন ইহা সুস্পষ্ট। ঘটনা-সন্নিবেশ, চরিত্রচিত্রণ, এমনকি কথোপকথনে পর্যন্ত এই প্রভাব আত্মপ্রকাশ করিয়াছে। কিন্তু *সধবার একাদশী* অধিকতর পূর্ণাঙ্গ প্রহসন।' (অজিত ঘোষ : ৯২) *সধবার একাদশী* যেমন *একেই কি বলে সভ্যতার* অনুকরণে রচিত, তেমনি *বিয়ে পাগলা বুড়ো*ও মধুসূদন দত্তের প্রহসন *বুড়ো সালিকের ঘাড়ে রোঁ*-এর প্রভাবে পরিকল্পিত। তৃতীয় প্রহসন *জামাই বারিকে* ধিক্কার জানানো হয়েছে কুলীন ঘরজামাই রাখবার প্রথা এবং বহুবিবাহ রীতির প্রতি।

মাইকেল মধুসূদন দত্তের *একেই কি বলে সভ্যতা?* কিংবা দীনবন্ধু মিত্রের *সধবার একাদশী* যে বিষয়ভাব অবলম্বনে রচিত, তা আরো ব্যাপকভাবে শিল্পরূপ পেয়েছে

অমৃতলালের প্রহসনে। নাটক রচনায় অমৃতলাল ইতিহাস কিংবা পৌরাণিক কাহিনি অনুসরণ করলেও তাঁর প্রহসনগুলোর কাহিনী-পট নির্মিত হয়েছে উনিশ শতকের বিভিন্ন সামাজিক বাস্তবতা এবং আন্দোলনের প্রতিক্রিয়ায়। তিনি বিশ্বাস করতেন, জীবনের সর্বক্ষেত্রে বিলেতি অনুকরণের দরুন একসময় সমাজ-পরিসরে সৃষ্টি হবে তীব্র অস্তিত্ব-সংকট। স্বকীয়তা বিসর্জন দিয়ে অনুকরণবৃত্তির মধ্য দিয়ে জীবনমুক্তি যে অসম্ভব – তাঁর বিভিন্ন প্রহসনে এ বক্তব্যই প্রতিপাদিত হয়েছে। বাংলাভূমির প্রাচীন ঐতিহ্য ও অনুশাসনের প্রতি গভীর ভক্তিমান হওয়ায় তাঁকে রক্ষণশীল নাট্যকার হিসেবে চিহ্নিত করা হয়; পাশ্চাত্য শিক্ষাব্যবস্থা সম্পর্কেও তাঁর মনোভাব বিরূপ– এটিই অমৃতলাল সম্পর্কিত প্রচলিত মত। কিন্তু এমন একরৈখিক ধারণা সর্বাংশে সত্য নয়। লেখক স্বয়ং সমকাল-প্রচলিত শিক্ষাব্যবস্থার সঙ্গে পরিচিত ছিলেন। সাহিত্যচর্চা এবং নটচর্যার পাশাপাশি বিদ্যালয়-পরিচালনার মতো গুরুদায়িত্ব তিনি সম্পাদন করেছেন দীর্ঘসময়।[১] বস্তুত প্রগতিশীলতা নয়, প্রগতির নামে যে সকল অনাচার সে সময়ের বাঙালির সামাজিক জীবনকে বিপন্ন করে তুলেছিল, তার অকুণ্ঠ সমর্থন তিনি করতে পারেননি। নবজাগরণকেন্দ্রিক বিকশিত বাবু শ্রেণির নানামাত্রিক চারিত্রিক দুর্বলতা ও অসঙ্গতি তিনি তাঁর প্রহসনে উন্মোচন করেছেন; একইসঙ্গে সমাজ ও জাতির পক্ষে যা কিছু অকল্যাণকর তার তীব্র বিরোধিতা করেছেন। নকলনবিস বাঙালি সাহেব, স্বার্থান্বেষী জননেতা, ভণ্ড সমাজসংস্কারক, ভঙ্গিসর্বস্ব 'ভারত-সন্তান', পুত্রের বিবাহে পণলোভী পিতা, সমাজচ্যুত পাশ্চাত্য অনুরাগী নারী, আতিশয্যদুষ্ট ব্রাহ্মসমাজ প্রভৃতি তাঁর কৌতুকের উপলক্ষ হয়েছে। 'যে নাটক-নাটিকায় তিনি এক সম্প্রদায়ের কাছ থেকে প্রচুর প্রশংসা পেয়েছেন এবং অন্য সম্প্রদায়ের কাছ থেকে প্রচুর নিন্দা-বিদ্রূপ লাভ করেছেন, সেগুলি হল তদানীন্তন সামাজিক অনাচার ও বাড়াবাড়ি সম্পর্কে তাঁর তীব্র ব্যঙ্গ বিদ্রূপের কশাঘাত।' (অসিত : ১৩৭৮ : ৪৬৯-৪৭০) সংখ্যাতাত্ত্বিক দিক থেকে যেমন অমৃতলাল বসুর প্রহসন সমৃদ্ধ[২], তেমনি সমকালীন সামাজিক বাস্তবতার রূপায়ণ এবং নান্দনিক বিবেচনায় তাঁর প্রহসনগুলো তাৎপর্যমণ্ডিত। আলোচ্য প্রবন্ধে *বিবাহ-বিভ্রাট* (১৮৮৪), *বাবু* (১৮৯৪) এবং *বৌমা* (১৮৯৭)– অমৃতলাল বসুর প্রতিনিধিত্বশীল প্রহসন হিসেবে মূল্যায়িত হবে।

দুই

অমৃতলাল বসুর বহুজননন্দিত প্রহসন *বিবাহ-বিভ্রাট*। সমকালে এটি সুধীমহলে ব্যাপকভাবে সমাদৃত হয়।[৩] পরবর্তীকালে সমালোচকরাও প্রহসনটিকে তাঁর গুরুত্বপূর্ণ শিল্পকর্ম হিসেবে বিবেচনা করেন। ড. সুকুমার সেনের মতে, *'বিবাহ-বিভ্রাট* অমৃতলালের শ্রেষ্ঠ রচনার অন্যতম। বইটির অভিনয়ের পর হইতে কৌতুকনাট্যকাররূপে অমৃতলালের খ্যাতি প্রতিষ্ঠিত হয়। অশিক্ষিত বাঙ্গালী যুবকের বিলাতে গিয়া সাহেব হইবার নেশা, বাঙ্গালী মেয়ের ইংরেজী শিক্ষা পাইয়া ফিরিঙ্গি মে

সাজা, বিলাতফেরত অকালকুষ্মাণ্ডের আত্মগরিমা, এবং সর্বোপরি পুত্রের বিবাহে অর্থ-আদায়ের জুলুম,– এই প্রহসনখানির অনেকটা জমাট এবং কয়েকটা সস্তা কৌতুকরসের মধ্যে প্রতিফলিত।' (সুকুমার ১৪২১ : ৩৫৭) তিনি এটিকে আখ্যায়িত করেছেন 'শিক্ষাত্মক প্রহসন' হিসেবে। এখানে দেখা যায়, গোপীনাথ সরকারের নিকট ব্যবসায় এবং অর্থোপার্জনের একমাত্র উপায় হচ্ছে পুত্রের বিবাহ-সম্পাদন। প্রতিবেশী চন্দ্রনাথ চক্রবর্ত্তী সুদাসল বাবদ তার পাওনা দাবি করলে গোপী পুত্রের বিবাহ দিয়ে ঋণ-পরিশোধে উদ্যোগী হয়। এক্ষেত্রে রূপ-গুণ কিংবা বংশপরিচয় নয়, অর্থসম্পদকে সে মনে করে কনে নির্বাচনের মানদণ্ড। পুত্রের পছন্দ-অপছন্দকে গুরুত্ব প্রদান না করে কেবল বিষয়বৈভবের মোহে সে 'Swindle Smuggle Company'র ক্যাশিয়ার মন্ময়নাথ মিত্রের কন্যা কুমুদিনীর সঙ্গে পুত্রের বিবাহ স্থির করে। অথচ তার পুত্র নন্দলাল এ সম্বন্ধকে স্বাভাবিকভাবে গ্রহণ করতে পারে না। পুত্রবধূ নির্ণয়ের ক্ষেত্রে স্থূলকায় কনে গোপীর অধিক পছন্দের। একহারা সুন্দর মুখশ্রীর মেয়ে সে তার ব্যবসায়ে বিঘ্নস্বরূপ মনে করে; কেননা এর ফলে কনের পিতৃপক্ষ প্রদত্ত গয়না ওজনে হালকা হওয়ার সম্ভাবনা থাকে। কনের অসহায় পিতার ওপর গোপী চাপিয়ে দেয় কড়া পণ। একের পর এক গয়নায় পণের ফর্দ ভারি হয়ে উঠলেও নিবৃত্ত হয় না সে। এক-পর্যায়ে গয়নার পরিবর্তে সে দাবি করে সমমূল্যের অর্থ এবং স্যাকরার মজুরিও সে ছাড় দিতে নারাজ। সবমিলিয়ে একশ ভরি স্বর্ণ ও দেড়শ ভরি রৌপ্যের মূল্য দাঁড়ায় তেইশশত টাকা। গোপীর অমানবিক ব্যবহারে প্রতিবেশী চন্দ্রনাথ চক্রবর্ত্তী ব্যথিত হয়ে তার পাওনা অর্থের সুদের অংশ সম্প্রদান করতে চায় এবং বিনিময়ে কন্যাদায়গ্রস্ত পিতার প্রতি গোপীর সহানুভূতি প্রত্যাশা করে। কিন্তু চন্দ্রনাথের এ ধরনের মানবিক আবেদন তার হৃদয়ে কোনো করুণা সঞ্চারিত করতে পারে না। গোপী পুত্রের বিদ্যার্জনের গৌরবে আত্মহারা। সদম্ভে সে জানিয়ে দেয়– 'পাঁচ জায়গায় ঘুরে এস। এল.এ. পড়া ছেলে এর চেয়ে কোথায় সস্তা পাও, দ্যাখ।' (প্রথম অঙ্ক : প্রথম গর্ভাঙ্ক) গোপীর চাহিদা ছিল অফুরান। নগদ অর্থই নয়, পুত্রের জন্য গোপী প্রত্যাশা করে নিত্য-ব্যবহার্য দ্রব্যাদি। যেমন : সোনার ঘড়ি, হিরার আংটি, চশমা ইত্যাদি। এমনকি ফুলশয্যা উপলক্ষে অতিরিক্ত দুশো টাকাও সে আদায় করে। শেষপর্যন্ত তার পাওনার অঙ্ক হয় চার হাজার দুশো টাকা। সে এতটাই কৃপণ ও স্বার্থপর যে, বিবাহের ঘটককে নির্ধারিত পারিশ্রমিক প্রদানে অস্বীকৃতি জানায়। সম্মানী হিসেবে সে ধার্য করে চুক্তিকৃত বরপণের অতিরিক্ত যে-অর্থ ঘটক আদায় করতে পারবে– তার অর্ধাংশ। বিশাল অঙ্কের পণের মধ্যে গোপী বিবাহোপলক্ষে ব্যয় করতে চায় মাত্র পঞ্চাশ-ষাট টাকা; অবশিষ্ট অর্থ দিয়ে সে মুদির বকেয়া, বাড়ি ও গহনা বন্ধক, ঝি এবং ধোপার পাওনা পরিশোধের চিন্তা করে। বাঙালি মধ্যবিত্ত জীবন-পরিসরে যৌতুকপ্রথার প্রভাব কীরূপ বর্বর ও নৃশংস হতে পারে, তারই চিত্র এটি। বিবাহের দিন আচার্য, পুরোহিত, প্রামাণিকদের দক্ষিণা প্রদানের ভয়ে সে

বরাভরণের সম্পূর্ণটাই রাখে পুত্র নন্দের কাছে। পরিশেষে এই অর্থ-সম্পদ আত্মসাৎ করে নন্দ বিলেত-যাত্রার উদ্যোগ নেয়। ফলত ব্যর্থ হয় গোপীর সমস্ত অপকৌশল। অবশ্য এ ঘটনায় তার মনোদৃষ্টি উন্মোচিত হয় এবং সে জাগ্রত হয় মানব-মহিমায়। নাটকের পরিশেষে তার স্বগতোক্তি লক্ষণীয় :

> ভিক্ষার ঝুলি আছে, গলায় দেবার দড়ী আছে– সেও ভাল। কিন্তু কেউ যেন ছেলে মেয়ের বিয়ে দিয়ে টাকা রোজগারের চেষ্টা না করে – অতি ইতর! অতি চামার!! অতি কসায়ের কাজ!!! (দ্বিতীয় অঙ্ক : চতুর্থ গর্ভাঙ্ক)

তুলনামূলক বিচারে গোপীর স্ত্রীর মানসিকতা স্বামীর থেকেও অনুদার। বাড়ির ঝি তার সম্পর্কে বলেছে– 'গিন্নী আমার কর্ত্তার বাবা।' নগদ অর্থই কেবল নয়, কনের পিতার বসতবাড়ির প্রতিও তার লুব্ধদৃষ্টি। পুত্রবধূ বাড়িতে আসবার পর সে তার ওপর সকল প্রকার সাংসারিক কাজকর্ম চাপিয়ে দেবার উদ্যোগ নেয়। নন্দের বিবাহ সুষ্ঠুভাবে সম্পন্ন হবার পর সে বৎসরান্তে পুনরায় পুত্রের বিয়ে দিতে চায় এবং পূর্বের তুলনায় অধিক পণ আদায়ের মাধ্যমে সমৃদ্ধি অর্জনের স্বপ্ন দেখে। স্বামীকে সে বলেছে :

> আচ্ছা, এবার তুমি কোট কর–আমি আর হাত দেব না, কিন্তু বছরের ভেতর বৌটার যদি ভালোমন্দ হয়–নন্দর তদ্দিনে পাশ বাড়বে, দেখো দেখিন–তখন ছেলের ফের বে দিয়ে আমি দোতালা বাড়ী, আর নিজের গা-ভরা গহনা কত্তে পারি কি না। (প্রথম অঙ্ক : তৃতীয় গর্ভাঙ্ক)

গোপীনাথের পুত্র নন্দলাল, মি. সিং এবং বিলাসিনী কারফরমা চরিত্রের মধ্য দিয়ে নাট্যকার নব্যপ্রতিষ্ঠিত পাশ্চাত্য শিক্ষিতদের একটি অংশের বিকারগ্রস্ততাকে কটাক্ষ করেছেন। বিদ্যা অর্জনের অহংকারে যারা কাণ্ডজ্ঞানবিস্মৃত, আধুনিকতা কিংবা প্রগতিশীলতার ব্যানারে যারা সমাজে নানারকম অনাচার, উচ্ছৃঙ্খলতা ও ভণ্ডামিতে লিপ্ত – তাদের অন্তঃসারশূন্যতার প্রকৃত স্বরূপ চিত্রাঙ্কন করেছেন তিনি। নন্দলাল এ প্রহসনে 'চাদর-নিবারণী সভা'র সদস্য। পাশ্চাত্য শিক্ষা তাকে আলোকিত করতে পারেনি; বরং তার চিন্তা-চেতনাকে করেছে বিকৃত। বিজ্ঞানবুদ্ধির মাধ্যমে সে এ-বিশ্বাসে স্থিত হয়েছে যে, মহাজগতে ঈশ্বরের কোনো অস্তিত্ব নেই। *বিবাহ-বিভ্রাটে* সে আবির্ভূত হয়েছে 'বিলেতী-বাবু' হওয়ার আকাঙ্ক্ষা নিয়ে। নিজের সত্তা থেকে বাঙালি পরিচয় অপসৃত করে সে গোত্রান্তরিত হতে চায় এবং বিলেত থেকে ফিরে এসে 'ভাত-কাপড় নিবারণী সভা' প্রতিষ্ঠার ঘোষণা দেয়। ডাক্তার মি. সিং-কে লক্ষ করে সে যা বলেছে, তাতে স্পষ্ট হয়েছে তার অন্তর্লোকের আকাঙ্ক্ষা– 'আচ্ছা আপনি তো এই দশমাস ছিলেন, দশমাসে সব সাহেবের মতো হওয়া যায়?' (প্রথম অঙ্ক : দ্বিতীয় গর্ভাঙ্ক) পিতার পছন্দের পাত্রীর সঙ্গে বিবাহে তার ছিল ঘোর আপত্তি। এতৎসত্ত্বেও এ-সম্বন্ধ প্রতিষ্ঠার মধ্য দিয়ে সে সমাজ, পিতা এবং শ্বশুরকে শাস্তি দিতে চায়। সহধর্মিনীর প্রতি

নন্দলালের হৃদয়ে কোনো ভালোবাসা উদ্রিক্ত হয় না। তার বান্ধবী বিলাসিনী যখন তাকে বলে–'বালিকার দশা কি হবে?', তখন প্রত্যুত্তরে সে যা জানিয়েছে, তা কুরুচিপূর্ণ : 'There are ten thousand bechelors to choose from, যাকে ইচ্ছা, ফের বে কত্তে পারে।' (প্রথম অঙ্ক : দ্বিতীয় গর্ভাঙ্ক)

বিলাসিনীর প্রতি দুর্বলতা লালন করে নন্দলাল; যার পরিপ্রেক্ষিতে বিলেত যাবার প্রাক্কালে সে বিলাসিনীর একটি 'ফটোগ্রাফ' প্রত্যাশা করে। ফুলশয্যার রাতেও নববধূর নিকট সে বারবার উত্থাপন করে এই নারীর প্রসঙ্গ– 'হায় দেশের কি ভয়ানক পতিতাবস্থা! কবে আমাদের দেশীয় স্ত্রীলোকগণ বিলাসিনী কারফরমা, কামিনী ভট্টাচার্যের মতো হবে !' (দ্বিতীয় অঙ্ক : দ্বিতীয় গর্ভাঙ্ক) কখনও কখনও নারীর প্রতি তার দায়বদ্ধতা এত প্রবল হয় যে, নিজ স্ত্রীকে সে সম্বোধন করে 'ভগ্নী' বলে। এ প্রহসনে দেখা যায়, নন্দলাল সর্বত্র নিজের বিদ্যাপ্রচারের অপচেষ্টা চালায় এবং জ্ঞানার্জনের দাম্ভিকতায় শ্বশুর, ঘটক ও অন্যান্য আত্মীয়-স্বজনের সঙ্গে অসৌজন্যমূলক আচরণ করে। পিতা-মাতার প্রতিও ভক্তি-শ্রদ্ধার লেশমাত্র নেই তার মধ্যে। বিলেত-গমনের পূর্বমুহূর্তে পিতাকে লক্ষ করে সে বলেছে– 'তুমি বড় অসভ্য, লেডীর মান জান না। চল্লেম, মাকে আমার কমপ্লিমেন্ট দিও। আর দুজনেই একটু ইংরেজি পড়।' (দ্বিতীয় অঙ্ক : চতুর্থ গর্ভাঙ্ক) কাহিনির অন্তিমে দেখা যায়, বাসর রাতে শ্বশুরালয় থেকে পণ-বাবদ অর্থ এবং স্ত্রীর বড় বোনের গহনার বাক্স আত্মসাৎ করে নন্দ পালিয়ে যায়। এসময় মন্ময়বাবুকে উদ্দেশ্য করে জনৈক প্রতিবেশীর সংলাপে পরিস্ফুট হয়েছে নন্দের প্রতি নাট্যকারের বিদ্রূপাত্মক মনোভাব –

> পাশ করা ছেলে শুনে একেবারে নেচে উঠলেন, আমাদের পাঁচজনের সঙ্গে পরামর্শ নেই। কেমন ঘর, তার ভাল করে সন্ধান নেওয়া নেই, কোথাকার জোচ্চোর ছোট লোকের ঘর। (দ্বিতীয় অঙ্ক : তৃতীয় গর্ভাঙ্ক)

পদার্থবিদ্যায় ডিগ্রিপ্রাপ্ত বিলাসিনী 'পুরুষদমন সভা'র সদস্য। বিজ্ঞানশাস্ত্রে তার ব্যাপক উৎসাহ ও আগ্রহ প্রদর্শন কেবল লোকদেখানো এবং একটি স্বতন্ত্র সামাজিক অবস্থান তৈরির কৌশল। একসময় উমাচরণের সঙ্গে তার বিবাহের কথাবার্তা হয়। কিন্তু মায়ের মৃত্যুর পর উমা খালি পায়ে হাঁটলে এবং অন্যান্য হিন্দু রীতি অনুসরণ করলে বিলাসিনী তাকে 'অসভ্য' বলে আখ্যায়িত করে এবং কিছুদিন পর গৌরীকান্তকে বিবাহ করে। *বিবাহ-বিভ্রাটে* তার দাম্পত্যজীবনের যে চিত্র উদ্ভাসিত হয়েছে, তা আবহমান বাংলার স্বামী-স্ত্রীর চিরায়ত মধুর সম্পর্কের পরিপন্থী। স্বামীকে সে 'স্টুপিড' হিসেবে অভিহিত করে এবং যে কোনো কথাতেই 'shut up' বলে থামিয়ে দেয়। আদর্শ স্বামীর বৈশিষ্ট্য নির্ণয়ে সে বলেছে– 'পতির প্রধান গুণ স্ত্রী ভক্তি, যে পতি স্ত্রীকে ভক্তি করে না সে ব্যভিচারী, পুরুষ বেশ্যা।' (প্রথম অঙ্ক : দ্বিতীয় গর্ভাঙ্ক) প্রহসনে গৌরীকান্তকে রন্ধনকার্যে পারদর্শী করতে বিলাসিনী তাকে 'theory of heat' শেখাতে প্রয়াসী হয়। স্বামী তার দৃষ্টিতে বাড়ির পরিচারক মাত্র। স্বামীর প্রতি তার আদেশের ভঙ্গি এরকম–

> আমি সকাল সকাল খেয়ে বেরুব; আজ 'পুরুষদমন সভা'র anniversary, রাত্রে ফিরতে পারব কি না বলতে পারি না ; তোমার মাছের ঝোলটোল যা হয় পরে কর। আমার এক প্লেট sag pudding আর খান চারেক কাটলেট ভেজে দিও ; কিন্তু দেখো যেন সেদিনকার মত পুড়িয়ে ফেল না। (প্রথম অঙ্ক : দ্বিতীয় গর্ভাঙ্ক)

শেষ দৃশ্যে সদ্য বিবাহিত স্ত্রীকে বাসরশয্যায় রেখে নন্দ পলায়ন করলে বিলাসিনী খুশি হয় এবং মন্তব্য করে– 'দম্পতির মনে প্রণয় না জন্মিয়ে বিবাহ দেওয়ার উপযুক্ত ফল।' (দ্বিতীয় অঙ্ক : চতুর্থ গর্ভাঙ্ক) এসময় গোপী সন্তানকে ঘরে ফিরবার আহবান জানালে সে নন্দকে বিলেত গমনের জন্য উদ্বোধিত করে এবং এ কাজটিকে তার দায়িত্ব বিবেচনা করে। এই অধুনা নারী তাই লেখকের উপহাসের লক্ষ্য হয়েছে। মি. সিংয়ের সংলাপের মধ্য দিয়ে প্রকাশিত হয়েছে বিলাসিনীর প্রতি তাঁর শ্লেষাত্মক মনোভাব– 'বিজ্ঞান স্ত্রীলোকের হাতে পড়ে এমন কোমল দাঁড়িয়েছে যে, সে সব গাড়ীতে চড়লেই ঘুম আসে।' (প্রথম অঙ্ক : দ্বিতীয় গর্ভাঙ্ক) নারীর বিদ্যার্জনকে অমৃতলাল অন্যায় বিবেচনা করেননি। কিন্তু বিদ্যার্জনের সঙ্গে সঙ্গে পাশ্চাত্য ভাবধারা অনুকরণ করায় অনেক ক্ষেত্রে নারী বিস্মৃত হচ্ছে নৈতিক মূল্যবোধ এবং সাংসারিক কর্তব্য। এভাবেই বিঘ্নিত হচ্ছে পারিবারিক সৌহার্দ্য এবং সামাজিক ভারসাম্য। কাজেই নারী জাতি, নারী শিক্ষা, এবং নারী স্বাধীনতার প্রতি ব্যক্তিগতভাবে শ্রদ্ধাবান হলেও বিলাসিনীর বেপরোয়া জীবনাচার সমর্থন করেননি অমৃতলাল বসু। আত্মস্মৃতিতে তিনি যা বলেছেন, তা বিবেচনাযোগ্য–

> নারী-চরিত্রের এই বিচিত্রতা সত্ত্বে-ও কুটুম্ব-কুটুম্বিনী-পরিবৃত একান্নবর্ত্তী সংসারে সহ্যসংযমে আমাদের দিন এক রকমে চ'লে যাচ্ছিল কিন্তু পাঠশালা-সাহিত্যে বিলাতী ডুবালের প্রবেশের পর আমাদের বৈঠকী সাহিত্যে যখন বিলাতী প্রণয় বা 'লভ্' দেখা দিল, তখন চক্ষুলজ্জার পর্দ্দা একেবারে গুটিয়ে উঠ্‌ল। ... মা! কিছু মনে করো না, আমি তোমাদের নিন্দা করিনি, যা করেছি, তা ব্যাজস্তুতি। শাস্ত্র, সংস্কার, প্রবৃত্তি, সব-ই আমার মস্তক নারীর চরণে অবনত ক'রে দেয়। পুরুষ বীর হ'তে পারে, কিন্তু তোমরা বীরপ্রসবিনী ; পুরুষ বিদ্বান্ হ'তে পারে, কিন্তু নারী বিদ্বানের জননী; ত্যাগী সন্ন্যাসী পুরুষের-ও প্রসূতি রমণী। (অরুণ ১৯৮২ : ১২০-১২১)

নারী শিক্ষা ও স্বাধীনতার বিষয়ে স্বামী বিবেকানন্দ (১৮৬২-১৯০২) এবং বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের (১৮৩৮-১৮৯৪) মতাদর্শ সম্ভবত অমৃতলালের মানস-গঠনে বিশিষ্ট ভূমিকা পালন করেছিল। এ বিষয়ে তাঁদের সকলের চিন্তাস্রোত অভিন্ন বিন্দুতে মিলিত হয়েছে।[৪] মি. সিং এ প্রহসনে একজন বিলেতি ডিগ্রিধারী চিকিৎসক। বিলেত থেকে প্রত্যাবর্তনের পর মাতৃভূমি ও মাতৃভাষাকে সে অবজ্ঞা করে। বাংলা ভাষাকে সে ইংরেজি ঢঙে অর্থাৎ ইংরেজদের ন্যায় উচ্চারণ করে। লেখক এ হীনচেতা চরিত্রের মধ্য দিয়ে বিলেতি শিক্ষাব্যবস্থাকে ব্যঙ্গ করেছেন। নন্দের নিকট মি.সিং তার ডিগ্রিপ্রাপ্তি প্রসঙ্গে বলেছে :

> বিলাতে আমাদের মত জেন্টেলম্যানকে একজামিন দেবার ইচ্ছা না থাকলে compell করে insult করে না। আমাদের ইংলিশ manners দেখলেই বিদ্যা হয়েছে বুঝে নেয়। ফি দিলেই বুঝতে পারে respectable আর ডিগ্রী হয়ে যায়। (প্রথম অঙ্ক : দ্বিতীয় গর্ভাঙ্ক)

তিন

বাবু প্রহসনে নাট্যকার মুখোশধারী সমাজ সংস্কারকদের তিরস্কার করেছেন। ১৯১১ সালে প্রহসনটির ইংরেজি অনুবাদ হয়। নিবারণচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় অনূদিত *The Babu* পুস্তকাকারে প্রকাশের পর ভারতবর্ষের অন্য ভাষাভাষীরাও অমৃতলালের নাট্যদৃষ্টির সঙ্গে পরিচিত হয়। এ প্রহসনের প্রধান চরিত্র ষষ্ঠীচরণ ইংরেজি শিক্ষিত বাবু এবং একটি নামসর্বস্ব ইংরেজি পত্রিকার সম্পাদক। ইংরেজদের সঙ্গে সুসম্পর্ক স্থাপন করতে ব্যতিব্যস্ত সে। এ কারণে নিজেকে ষষ্ঠীচরণ বটব্যাল না বলে মিস্টার এস. কে ভ্যাটভ্যাল বলে পরিচয় দেয়; যেন 'সাহেবেরা মনে করে – বাবু কোন ইডরু-পিডরুর দৌহিত্র।' (প্রথম অঙ্ক : প্রথম গর্ভাঙ্ক) ভারতীয় সংস্কৃতিতে প্রণামের প্রত্যুত্তর জানাবার পন্থা তার অজানা। দুর্ভিক্ষকালে গ্রামের অনেকেই শরণাপন্ন হয় এই অর্বাচীন সম্পাদকের নিকট। কিন্তু অসহায় গ্রামবাসীর জন্য তার হৃদয়ে কোনো সমবেদনা সৃষ্টি হয় না। তার মতে– 'আগে ইংরেজী পড়তে শিখুক, তবে তাদের জন্য আমাদের মতো সভ্য লোকদের দয়া হবে, sympathy পাবে।' (প্রথম অঙ্ক : প্রথম গর্ভাঙ্ক) দেশের লোকসংখ্যা নিয়ন্ত্রণে অশিক্ষিত কৃষক সম্প্রদায়ের মৃত্যুই ষষ্ঠীর কাম্য। দুর্ভিক্ষ প্রপীড়িত গ্রাম প্রদর্শনের জন্য তার শর্ত অন্তহীন। যেমন : তার সম্পাদিত পত্রিকার দশটি সংখ্যার বার্ষিক অগ্রিমমূল্য, ট্রেনের প্রথম শ্রেণির একটি টিকিট, ফিরিঙ্গি সাংবাদিকের জন্য একটি দ্বিতীয় শ্রেণির টিকিট, স্টেশন থেকে গ্রামে যাবার জন্য পালকি, বিভিন্ন ব্র্যাঞ্চের টেলিগ্রাফ খরচ, দেবদারু পাতা সহযোগে নির্মিত ফটক, রাত্রে আলোর পর্যাপ্ত ব্যবস্থা, কনসার্টের আয়োজন করা প্রভৃতি। একইসঙ্গে স্থানীয় জমিদার সীতানাথ সিঙ্গি তার পত্রিকা ক্রয় না করার কারণে প্রজাদের সে খাজনা দেয়া থেকে বিরত থাকার পরামর্শ দেয় এবং পত্রিকায় ভিত্তিহীন সংবাদ প্রচার করতে চায়, যেখানে উল্লেখ থাকবে জমিদারের পীড়নেই প্রজারা মৃত্যুবরণ করছে।

ষষ্ঠীচরণ বিবেচনা-বর্জিত চরিত্র। সে এতটাই অধঃপতিত যে, গর্ভধারিণী মাকে অস্বীকার করতে দ্বিধাবোধ করে না। মাকে সে বলেছে – 'কেউ যদি এসে টের পায় যে, তোমার গর্ভে আমি জন্মেছি, তা হলে আমায় শুদ্ধ অশিক্ষিত ঠাওরাবে।' (প্রথম অঙ্ক : প্রথম গর্ভাঙ্ক) মাকে কোনো ভদ্রলোক দেখে ফেললে তার সম্মানহানি ঘটতে পারে, এমন আশঙ্কায় সে তাকে বাইরের ঘরে যেতে বারণ করে। মায়ের ব্যয়নির্বাহের জন্য প্রতি মাসে তার পক্ষ থেকে বরাদ্দ থাকতো মাত্র তিন টাকা। পরবর্তীকালে সে যখন জানতে পারে, মাসে দুবার একাদশী পালন করে মা শ্রীমতী, তখন বরাদ্দকৃত অর্থ

থেকে বার পয়সা কম প্রদান করে। মায়ের পোশাক পরিচ্ছদের ব্যাপারেও ষষ্ঠীচরণ ছিল দায়িত্বজ্ঞানহীন। একারণে শ্রীমতী তার বোনের দেওয়া সামান্য 'ন্যাকড়া' দিয়ে কোনোরকম লজ্জা নিবারণ করে। এক পর্যায়ে সে বৃদ্ধ মাতাকে রোজগারের সন্ধান করতে বলে এবং সন্তানের প্রতি নির্ভরশীলতাকে ধিক্কার জানায়। ষষ্ঠীর নিকট মাতৃভক্তি অপেক্ষা 'ভারত-মাতা'র প্রতি ভক্তিই উত্তম। পক্ষান্তরে, স্ত্রী নীরদাকে সে লেডিরূপে গড়ে তুলতে চায় এবং বৈকালিক-বিহারে নিয়ে যায় ইডেন গার্ডেনে। এমন অস্বাভাবিক পরিস্থিতিতে অসহায় বোধ করে নীরদা। তার কাতরোক্তি লক্ষণীয় :

> ঘোমটা তুলে দিয়েছি, সময় সময় জুতো-মোজাও পরি, শাশুড়ীকে লজ্জা করিনি, ধমকে কথা কই, তোমার ইয়ারদের সামনে বেরুই, আর কি করতে হবে? (দ্বিতীয় অঙ্ক : প্রথম গর্ভাঙ্ক)

স্ত্রী তার কাছে প্রদর্শনীর সামগ্রী এবং সামাজিক মর্যাদা প্রতিষ্ঠার অন্যতম হাতিয়ার। প্রহসনের শেষদিকে ষষ্ঠীর প্রকৃত রূপ উন্মোচন করে তার শ্যালক ফটিকচাঁদ। ইংরেজ সাহেব সোলারের ছদ্মবেশে ইডেন গার্ডেনে সে নীরদার দিকে এগিয়ে যায়। এ ঘটনায় ষষ্ঠী এবং তার শুভানুধ্যায়ীরা নীরদাকে অরক্ষিত রেখে পলায়ন করে। নীরদার কাতর আর্তনাদেও তারা দয়া প্রদর্শন করে না, বরং আত্মরক্ষায় ব্যস্ত থাকে। একইসঙ্গে 'অহিংসা পরমো ধর্ম্ম'– এই বাণী উচ্চারণ করে কেউ কেউ অনুতাপ করে। নীরদাকে উদ্ধার করবার জন্য অবশেষে কয়েকটি প্রকল্প গ্রহণ করে তারা। যেমন–একটি কমিটি গঠন, গ্রামে গ্রামে চাঁদা উত্তোলন, পার্লামেন্টে ডেলিগেটস প্রেরণ প্রভৃতি। এরকম কাপুরুষতা এবং বকবৃত্তিকে তীব্র উপহাস করে ফটিক বলেছে– 'ধিক! ধিক! আপনার স্ত্রীকে অপমান হতে রক্ষা করবার ক্ষমতা নাই, আবার স্ত্রী-স্বাধীনতার কথা মুখে আন! তোমার গলায় দড়ি জোটে না। (দ্বিতীয় অঙ্ক : তৃতীয় গর্ভাঙ্ক)

সজনীকান্ত এবং বাঞ্ছারাম চরিত্রের মধ্য দিয়ে নাট্যকার কটাক্ষ করেছেন তৎকালীন ব্রাহ্মসমাজের অন্তর্ভুক্ত কতিপয় অসাধু ও নামধারী সমাজ-হিতৈষীর প্রতি। সজনী বিশ্বাস করে হিন্দু মাত্রই মিথ্যাবাদী, প্রতারক, অত্যাচারী, নারীবিদ্বেষী এবং তারা সকলেই নরকবাসী। এ কারণেই সে ব্রাহ্মধর্মে দীক্ষিত হয়। নিজ দলে অধিক সদস্য বৃদ্ধিতে সে সর্বদা তৎপর এবং বিধবা বিবাহ প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে ভারত-উদ্ধারের স্বপ্নে মগ্ন। সজনীকান্তের বক্তব্যে আলোড়িত হয়ে কন্দর্পকান্ত তার বৃদ্ধা মাতামহী আজিমাকে পুনরায় বিয়ে দিতে চায় এবং নিজেও বিধবা নারীদের বিবাহ করে সমাজের উন্নতি সাধনের চিন্তা করে। সজনীর চিন্তাচেতনা সংকীর্ণ এবং বর্বর। নিজ সম্প্রদায়ের স্বার্থরক্ষার্থে একদিকে সে আদালতে মিথ্যা সাক্ষ্য দেয়, অন্যদিকে দুদিন অনুতাপভোগে নিজেকে কলঙ্কমুক্ত করতে চায়। সজনীকান্তের নিষ্ঠুরতার প্রমাণ মেলে প্রতিবেশী গুরুচরণের মাতার মৃত্যুকালে। হিন্দু ধর্মাবলম্বী হবার কারণে সে তার জমির ওপর দিয়ে গুরুচরণের মাতার শবযাত্রায় বাধা দেয়। নিজ পত্নীকে সজনী সম্বোধন করে 'স্বামিনী'

বলে এবং স্ত্রীর প্রথমপক্ষের কন্যা তাকে ডাকে 'ছোটবাবা'। দেশের সমৃদ্ধির জন্য তারা মেয়েটিকে চিরকুমারী রাখতে চায় এবং নাম দেয় কুমারী সৌধকিরীটিনী। সজনীকান্ত নারী স্বাধীনতায় বিশ্বাস করে। তবে এ নিয়ে তার অধিক উৎসাহ প্রহসনে বিবৃত হয়েছে হাস্যকরভাবে। যেমন, নীরদাকে সে বলেছে– 'কেবল দৌড়, দৌড় ভিন্ন ভারতের স্বাধীনতার আর দ্বিতীয় উপায় নাই।' (দ্বিতীয় অঙ্ক : তৃতীয় গর্ভাঙ্ক)

ব্রাহ্মধর্মাবলম্বী অপর চরিত্র বাঞ্ছারাম। সে ছিঁচকাঁদুনে; প্রতি বছর বিয়ে করে এবং ভ্রাতা-ভগিনী সম্পর্ক বৃদ্ধি করে। পিতার নাম তার কাছে অশ্লীল মনে হয়। পরিবারের সঙ্গে কোনো যোগাযোগ নেই তার। সহোদর ভ্রাতাকে গৃহছাড়া করবার চক্রান্তে লিপ্ত থাকলেও দুর্ভিক্ষতাড়িত নাড়াজোলবাসীদের জন্য বাঞ্ছা নিবেদিতপ্রাণ। স্মরণীয় যে, দুগর্তদের প্রতি তার এ ধরনের সহানুভূতি কোনো ধর্মীয় অনুশাসন কিংবা সামাজিক কল্যাণবোধ থেকে জাগ্রত হয় না। দুর্ভিক্ষ তাঁর পরম কাম্য। কেননা এসময় ব্রাহ্মসম্প্রদায়ের পক্ষে সে চাঁদা সংগ্রহের সুযোগ পায় এবং পুরো অর্থই আত্মসাৎ করে। স্ত্রীর কাছে এ প্রসঙ্গে বাঞ্ছা বলেছে –

> প্রেমের কি অপার মহিমা, কিছুই বুঝা যায় না, অথচ দুর্ভিক্ষ, বন্যা প্রভৃতি দেশের কোন অমঙ্গল হলেই আমার অন্ন-কষ্ট থাকে না, বরং কিছু সঞ্চয় হয় ; আমার বোধ হয়, পাপী হিন্দুদিগের অমঙ্গলে আমাদের মঙ্গল, তাই এরূপ পবিত্র ঘটনা হয়, দুর্ভিক্ষের জন্য প্রার্থনা কর, সকল বাসনা পূর্ণ হবে। (প্রথম অঙ্ক : তৃতীয় গর্ভাঙ্ক)

একাধিক পত্নী বর্তমান থাকা সত্ত্বেও নানারকম মিথ্যা আশ্বাসে বাঞ্ছারাম অধিকবয়স্কা ক্ষমাসুন্দরীর পাণিগ্রহণ করে। এরপর সে ক্ষমাকে না জানিয়ে তার সমস্ত গহনা বিক্রয় করে দেয়। অপহৃত গয়না উদ্ধারের জন্য তার স্ত্রী পুলিশের শরণাপন্ন হতে চায়। ক্ষমার দৃষ্টিতে বাঞ্ছা চোর, প্রতারক এবং ভণ্ড। প্রহসনে ক্ষমাসুন্দরী প্রকৃতই প্রতিবাদী নারী চরিত্র। ব্রাহ্ম সম্প্রদায়ের অন্তর্ভুক্ত হয়েও প্রতি মুহূর্তে সে তাদের নানা অসংলগ্ন কার্যক্রমের প্রতিবাদ করে। একটি বিষয় উল্লেখযোগ্য, অমৃতলাল ব্রাহ্মধর্মকে নয়, কেবল এ মতবাদকে আশ্রয় করে যারা অনাচার, চাঁদাবাজি কিংবা নোংরামিতে লিপ্ত, তাদের বিরুদ্ধাচরণ করেছেন। ব্রাহ্মধর্মের আধ্যাত্মিকতা কিংবা এর প্রবক্তাদের প্রতি নাট্যকারের ভক্তিবোধ ছিল অপরিসীম। তিনি জানতেন, হিন্দুদের সনাতনী মূল্যবোধ এবং ব্রাহ্মদের সমাজ-সংস্কারের অন্তরালে কিছু সুবিধাভোগী জনশ্রেণি ধর্মকে ব্যবসায়ে পরিণত করতে তৎপর। এ প্রহসনে তিনি উভয় সম্প্রায়ের অসাধু ধর্ম ব্যবসায়ীদের ভণ্ডামিকে ব্যঙ্গ করেছেন। ফটিকের সংলাপে এতৎসংক্রান্ত প্রামাণিক তথ্য উপস্থাপিত হয়েছে :

> আচ্ছা কি হওয়া যায় বল্ দেখি? দেশহিতৈষী হই, না ব্রেহ্মজ্ঞানী হই, না আজকাল যে ঐ হয়েছে গেরুয়া কামিজ টামিজ পরে হিঁদুয়ানি– তাই হওয়া যায়? কি করা যায়? বল্ দেখি বেশী সুবিধা কিসে? (দ্বিতীয় অঙ্ক : প্রথম গর্ভাঙ্ক)

অশনিপ্রকাশ চরিত্রের মাধ্যমে 'আঁতেল' বিজ্ঞানীর প্রতি নাট্যকার শ্লেষ প্রকাশ করেছেন, যে অবাস্তব আবিষ্কার-চিন্তায় ব্যস্ত থাকে। অশনি গ্যালভানিক ব্যাটারি তৈরি করে হিন্দু নারীর বৈধব্যের যন্ত্রণা নিবারণে প্রয়াসী; ইলেকট্রিসিটির মাধ্যমে সন্তান উৎপাদন, জাতিভেদ নির্মূল ও স্বাধীনতালাভে আগ্রহী; আগুন জ্বালিয়ে বৃষ্টিপাতে উৎসাহী এবং ছারপোকা থেকে সুগন্ধসমৃদ্ধ এসেন্স তৈরিতে পারদর্শী। ঈশ্বরে বিশ্বাস তার কাছে অবাস্তব ও অহেতুক। তার ধারণা পৃথিবীর সকল কিছুই সৃষ্টি হয় 'ফিজিক্যাল চেঞ্জে'র মাধ্যমে। অশনিপ্রকাশের বিবেচনায় ঈশ্বর এবং সে অভিন্ন :

> হ্যাঁ, ঐ সৃষ্টিকর্ত্তা বলে আপনারা তাঁকে ভারি বাড়িয়ে তুলেছেন, সৃষ্টি যে কেউ করেছে, তা আমি মানিনে, ফিজিক্যাল চেঞ্জে সবই আপনা আপনি হচ্ছে ; আর যদি কেউ করে থাকে, তাতে আর বেশীটা কি – না হয় সেই ঈশ্বর বল আর যাই বল, তিনি না হয় একটু বেশী সায়েন্সই পড়েছিলেন। আমাতে, তাঁতে এ ছাড়া আর কিছু অধিক তফাৎ দেখতে পাচ্ছিনে ; আমি যদি half an ounce protoplasm পাই, তাহলে আমিও এখনি একটা সৃষ্টি করতে পারি। (প্রথম অঙ্ক : তৃতীয় গর্ভাঙ্ক)

অন্যদিকে ফটিকচাঁদ এবং তিনকড়ি তাদের জাতিগত অবস্থান সম্পর্কে পুরোপুরি সচেতন। এজন্য তাদের প্রতি নাট্যকারের পক্ষপাত সুস্পষ্ট। তাদের প্রধান কাজ হচ্ছে প্রতিপক্ষের বক্তব্য ও কাজের অসারত্ব প্রমাণ করা; এবং সর্বত্র হিতোপদেশ বিতরণ করা। এরা লেখক-প্রতিনিধি হিসেবে বিশেষ কোনো উদ্দেশ্যের পৃষ্ঠপোষকতা করে। অমৃতলালের অধিকাংশ প্রহসনেই এ ধরনের টাইপ চরিত্রের সাক্ষাৎ পাওয়া যায়। কোনো কোনো সমালোচক এটিকে নাট্যত্রুটি হিসেবে চিহ্নিত করেছেন।[৫] *বাবুতে* তিনকড়ি ব্রাহ্মধর্মের নানা নেতিবাচক কাজের রূঢ় সমালোচনা করেছে। অন্যদিকে ইংরেজ সরকারের নানা সংস্কারমূলক কার্যক্রম, তাদের প্রবর্তিত টমটম গাড়ি, মদ্যপান প্রভৃতির তীব্র সমালোচনা করেছে ফটিক। বাঙালি চরিত্রের কারণে-অকারণে ইংরেজি শব্দের ব্যবহার এবং 'ইংরেজ' হওয়ার সাধনাকে সে কৌতুক করেছে এবং অবাধ স্বাধীনতার নামে নারী যে নানাভাবে অবমূল্যায়িত হচ্ছে– তা ব্যক্ত করেছে।

তৎকালীন উচ্ছৃঙ্খল শিক্ষার্থীদের অনিয়ন্ত্রিত, বলগাহীন জীবনাচারের চিত্রও এ প্রহসনে প্রকটিত হয়েছে। দ্বিতীয় অঙ্কের দ্বিতীয় গর্ভাঙ্কে, বেণী পিতার চাপকান থেকে এবং কৃষ্ণ তার মায়ের বাক্স থেকে টাকা চুরি করে বন্ধুদের সঙ্গে আমোদ প্রমোদে মগ্ন থাকে। স্কুল চলাকালে এরা যখন বন্ধু পরিবৃত হয়ে রাস্তায় ঘুরে বেড়ায়, তখন পিতৃস্থানীয় প্রতিবেশী গোবিন্দ বাঁড়ুয্যে তাদের শ্রেণিকক্ষে যাবার অনুরোধ করে। কিন্তু এ আহবান তারা উপেক্ষা করে। উপরন্তু বখাটের দল তাকে নানাভাবে অপমানিত ও বিপর্যস্ত করে; তার নিকট থেকে দেশলাই নিয়ে 'বার্ডসাই' জ্বালাতে চায়। বিভ্রান্ত এ তরুণেরা ঔদ্ধত্য প্রদর্শনের দুঃসাহস পায় ষষ্ঠীচরণের মতো কিছু অবিবেচক ব্যক্তির আশ্রয়-প্রশ্রয়ে। গোবিন্দ এদের অপকর্ম স্কুলের শিক্ষকদের জানাতে চাইলে, প্রত্যুত্তরে তাকে যা শুনতে হয়, তা যথার্থই ভীতিসঞ্চারী :

> আপিস করতে যাচ্ছ না, মিছে ফ্যাচাং কর কেন? তোমরা যেমন গোলামী কর, আপিসের সাহেবের বকুনির ধার ধর, আমরা অমন মাস্টারের বকুনির তোয়াক্কা রাখিনে, এক কথা বললে অমনি ঝাঁ করে নাম কাটিয়ে যাব, আমাদের ক্লাশে ইউনিটি আছে, সকলে এককাট্টা হয়ে মাস্টারকে এক দিন ছুটির পর রাস্তায় খুব ঠ্যাঙ্গানি দেব, তার পর গিয়ে ঝাঁ করে ষষ্ঠীবাবুর স্কুলে ভর্ত্তি হব। তিনি বলেছেন, আমাদের মতন মর‍্যাল্‌করেজওয়ালা ছেলে পেলে এক্লাশ উপরে ভর্ত্তি করবেন, আর আমি যদি দশটা ছেলে নিয়ে যেতে পারি, আমাকে ফ্রি করে নেবেন; বাবার কাছে মাসে মাসে ঠিক মাইনে আদায় করব, তাতে দুশ মজা ওড়ান যাবে। (দ্বিতীয় অঙ্ক : দ্বিতীয় গর্ভাঙ্ক)

সমকালীন প্রেক্ষাপটেই শুধু নয়, বর্তমান পরিস্থিতিতে এটি যে কতটুকু সত্য, তা সহজেই অনুমেয়। ড. সুকুমার সেন যথার্থই বলেছেন– 'নাট্যকার এখানে ভবিষ্যদ্‌বক্তা।' (সুকুমার ১৪২১ : ৩৫৮)

চার

বৌমা অমৃতলালের একটি সামাজিক নকশা। এর কেন্দ্রীয় চরিত্র বাবুরাম পাশ্চাত্য শিক্ষায় শিক্ষিত এবং 'স্বাধীনতাহীনতায় কে বাঁচিতে চায়'– এই মর্মবাণীতে বিশ্বাসী। 'ভারত-মাতা'র সম্মান রক্ষার জন্য এবং বাঙালি জাতির মর্যাদা সমুন্নত রাখতে সে ইংরেজের অধীনে কোনো চাকরি করতে চায় না। কিন্তু নিজ জননীর প্রতি ন্যূনতম দায়িত্বপালনের ক্ষেত্রে বাবুরাম নিতান্ত উদাসীন। মা অন্নপূর্ণার সঙ্গে তার ব্যবহার ছিল রুক্ষ ও ঔদ্ধত্যপূর্ণ। ষষ্ঠীচরণের মতো বাবুরামও তার জন্ম-উৎস নিয়ে সংশয় প্রকাশ করে। মায়ের নিকট থেকে অর্থ নিয়ে বাবুরাম পত্রিকা প্রকাশ করে এবং এভাবেই দেশোদ্ধারের স্বপ্ন দেখে। অন্নপূর্ণা তাকে এ কাজ থেকে একাধিকবার নিবৃত্ত করতে চেয়েছে। কিন্তু বাবুরাম তার সিদ্ধান্তে অটল। টাকা না দিলে সে আফিম খেতে চায়, বিলেতে পালিয়ে যাবার হুমকি দেয়।

বাবুরাম দেশের অবলা-সরল কুলনারীদের ভবিষ্যৎ নিয়ে চিন্তিত। এজন্য 'রিফরম ড্রেসে' সজ্জিত করে সে তাদের রোম্যান্টিক করে তুলতে প্রয়াসী হয়। হিন্দু সমাজে প্রচলিত কন্যাদায় এবং নারী নির্যাতনের প্রসঙ্গ সে পত্রযোগে কামস্কাট্‌কার প্রাইম মিনিস্টার, মেক্সিকোর গভর্নর, তুর্কির সুলতান প্রমুখকে অবহিত করে; যদিও তার নিজের বিবাহের সময় কনের পিতাকে গহনার সঙ্গে গুনতে হয় নগদ তিন হাজার টাকা। পণপ্রথার ভয়াবহতা সম্পর্কে বাবুরামের বোধোদয়ের পরও শ্বশুরপক্ষকে এ অর্থ ফেরত দেবার কোনো উদ্যোগ এ প্রহসনে পরিলক্ষিত হয় না। দেশমাতৃকা নিয়ে বাবুরামের ভাবনা অন্তহীন। ভারতোদ্ধারের লক্ষ্যে এবং রাজনৈতিক জ্ঞানলাভের উদ্দেশ্যে সে ভর্তি হয় 'পোলিটিক্যাল পাঠশালা'য়। দেশের আইন বিভাগ এবং শাসন বিভাগকে পৃথক করবার মতো গুরুতর কাজও সে সম্পাদন করবার ইচ্ছা প্রকাশ করে। এভাবে মহৎ কীর্তি স্থাপনের মধ্য দিয়ে সে চিরস্মরণীয় হয়ে থাকতে চায় :

> আমি যে এ জীবনটা কেরাণীর ডেস্কতে বা স্কুল মাষ্টারী করে কাটিয়ে যাব, তা হবে না। আমার ছেলেবেলা থেকেই পাবলিক কাজে টেষ্ট, স্কুলে পড়বার সময়েই আমি লাইব্রেরী আর চরিত্র-সংশোধনী সভা করেছিলাম! পাবলিকম্যান হবার আমার বরাবর সখ, যদি একটা নামই না রেখে গেলেম, তবে পৃথিবীতে এলেম কেন? (প্রথম অঙ্ক : প্রথম গর্ভাঙ্ক)

পারিবারিক পরিসরেও সে 'রিফরমেশনে'র প্রদীপ প্রজ্বলন করতে চায়। অন্নপূর্ণা পুত্রবধূকে রান্না করতে বললে এবং তাকে সকালের নাস্তা পরিবেশনে বিলম্ব করলে বাবুরাম জন্মদাত্রী মাকে ভর্ৎসনা করে। স্ত্রী তার দৃষ্টিতে রূপে-গুণে সরস্বতী, স্নেহে ভগিনী, যত্নে জননী, পরামর্শে মন্ত্রী, ভালোবাসায় প্রিয়সখী। অন্তরে গভীর অনুরাগ ও নীতিবোধ লালন করলেও প্রহসনের শেষদিকে জাল ঔষধের ব্যবসায় করবার অভিযোগে গ্রেপ্তার হয় বাবুরাম। পরবর্তীকালে মতিলালের হস্তক্ষেপে সে মুক্তি পায় এবং তার চৈতন্যোদয় হয়। বাবুরামের এমন চারিত্রিক বিচ্যুতির কারণ নির্ণয়ে মতিলাল বলেছে– 'গৃহস্থের ছেলের ইংরেজী চাল হয়েই সর্ব্বনাশ করলে আর কি।' (দ্বিতীয় অঙ্ক : চতুর্থ গর্ভাঙ্ক)

বৌমা প্রহসনে নিজের সীমায়িত গণ্ডির বাইরে কোনো কিছুই ভাবতে চায় না মতিলাল। তার বক্তব্য এবং চিন্তাচেতনা একরৈখিক ও উচ্চমার্গীয়। কিন্তু এই সত্যনিষ্ঠ ও বিদগ্ধ ব্যক্তিত্বের কোনো পরিচয়, কর্মক্ষেত্র কিংবা যোগ্যতা এখানে অনুদ্ঘাটিত। বাবুরাম যখন ভারতবর্ষীয় কন্যাদায়গ্রস্ত পিতার মনোযন্ত্রণা নিয়ে উদ্বিগ্ন এবং এতদুদ্দেশ্যে ইংরেজদের সহযোগিতা-প্রত্যাশী, তখন মতিলাল ইংরেজদের কটূক্তি করে বলেছে :

> ওরে হতভাগা, সাহেবদের এর আর জানাবি কি? আমাদের কন্যাদায়ের কথা বলছিস, ভদ্র ইংরেজদের ঘরে আইবুড়ো মেয়ের কি বিপদ, তা জানিস? দু পাঁচ হাজারে কুলায় না, অনেককেই আইবুড়ো চুল পাকিয়ে সন্ন্যাসিনী সাজতে হয়। মধ্যবিত্ত অবস্থার ইংরেজ ছেলেদের মধ্যে অনেকেই বিয়ে করে ফরচুন ফেরাবার আশায় বসে থাকেন। ওরা আবার আমাদের মেয়েদের বিষয়ে উপায় করবে কি রে! আগে আপনাদের ঘর সামলাক। (প্রথম অঙ্ক : প্রথম গর্ভাঙ্ক)

একই দৃশ্যে স্বদেশী আন্দোলনকারীদের 'ভারত-মাতা' চেতনা তার কাছে উপেক্ষিত :

> আজ কালিকার মহাপণ্ডিতেরা জগন্মাতাকে কেটে ছেঁটে ভারত-মাতা তৈয়ারী করেছেন। ক্রমে ক্রমে গাঁয়ে গাঁয়ে অলিতে গলিতে দেশহিতৈষিতা যেরকম ভাগাভাগি করে পৌঁছুচ্ছে, বেঁচে যদি থাকি তা বোধ হয় কলকেতা-মাতা, ঢাকা-মাতা, বাখরগঞ্জ-মাতা, পটলডাঙ্গা-মাতা, বৌবাজার-মাতা, বেলেঘাটা-মাতাও দেখতে পাব। (প্রথম অঙ্ক : প্রথম গর্ভাঙ্ক)

বিলাসিনী কারফরমার মতো হিড়িম্বা ইংরেজি শিক্ষিত ব্রাহ্মনারী। দুজনের চরিত্রের মধ্যে রয়েছে লক্ষণীয় সাযুজ্য। জীবনের প্রথম দিকে হিড়িম্বা ছিল মানবিকবোধ-সম্পন্ন। কিন্তু

পাশ্চাত্য শিক্ষার অহমিকায় সে এক পর্যায়ে হয়ে পড়ে দিগ্বিদিক জ্ঞানশূন্য। নিজেকে অল্পবয়সীরূপে উপস্থাপনের জন্য সে কাকি নয়, দিদি ডাক শুনতে ভালোবাসে। গ্রামীণ নারীদের আধুনিক ভাবাপন্ন করতে হিড়িম্বা বিভিন্ন ক্রীড়ার আয়োজন করে। যেমন : ব্যাডমিন্টন, টেনিস, ক্রিকেট, বাইসাইকেল রেস, পুরুষ-সহযোগে কানামাছি, বাজিসহ তাসখেলা প্রভৃতি। পিতৃবন্ধু বামাদাসের সঙ্গে তার প্রণয় এবং পরবর্তীকালে বিবাহ হয়। কিন্তু সাংসারিক জীবনে বামাদাসের সঙ্গে তার আচরণ ছিল প্রভু-ভৃত্যের মতো। এ প্রহসনে বিশু নাগের চাপরাশিকে বকশিস প্রদানে হিড়িম্বা অকৃপণ হলেও স্বামীর জরুরি প্রয়োজনে সে একটি টাকাও ব্যয় করতে অনিচ্ছুক। হিড়িম্বার নিকট বামাদাস নতুন জুতা ক্রয় করবার অনুমতি প্রার্থনা করলে স্বামীকে সে তার ফ্রেঞ্চ ভাষাশিক্ষক মন্মথ বাবুর একজোড়া পরিত্যক্ত জুতা ব্যবহারের নির্দেশ দেয়। আবার বামা স্বভাবসুলভ আঞ্চলিক ভাষায় কথা বললে স্বামীকে সে 'কান মল'তে বলে এবং এ কাজে বিলম্ব হওয়ায় বেহারাকে ডাকতে চায়। অবশ্য বামাদাসও মেরুদণ্ডহীন পুরুষ চরিত্র। স্ত্রীর প্রতি আনুগত্য প্রকাশে সে অকুণ্ঠচিত্ত। কারণে-অকারণে হিড়িম্বা তাকে অপমান-অপদস্থ করলেও সে কোনো প্রতিবাদবাক্য উচ্চারণ করে না, বরঞ্চ 'স্ত্রী-পূজা'য় নিজেকে নিঃশেষিত করবার ইচ্ছা পোষণ করে। স্ত্রীর জন্য সে 'গলায় দড়ি' দিয়ে প্রসন্ন চিত্তে প্রাণত্যাগ করতে প্রস্তুত কিংবা স্ত্রী কখনও দ্বিতীয় বিবাহে উদ্যোগী হলে সে তাতেও সম্মতি জ্ঞাপন করতে চায়। স্ত্রীর প্রতি কোমলপ্রাণ হলেও বাস্তবিক অর্থে বামাদাস ক্রূর চরিত্র। *বৌমা* প্রহসনে 'বাঙ্গালীত্ব বজায় রেখে বাঙ্গালীর উন্নতি করতে হবে'–এমন শ্লোগানে জনচিত্তকে উজ্জীবিত করতে চায় ষষ্ঠীবাবু। ব্রাহ্মদের সকল বিষয়ে অহেতুক 'বাড়াবাড়ি'র সমালোচনা করে সে। একারণে অন্যায় মামলা মোকদ্দমায় ষষ্ঠীকে অপদস্থ এবং বিপর্যস্ত করবার ষড়যন্ত্রে লিপ্ত হয় বামাদাস। হিড়িম্বার সঙ্গে তার কথোপকথনের মধ্যে এ ধরনের দুরভিসন্ধি স্পষ্ট হয়েছে। প্রাসঙ্গিক সংলাপ লক্ষণীয় –

বামা : একটা ডিফ্যার্মেসন্ কেস্; আজকাল অনেকেই কচ্ছে, চলছেও ভাল; ক্রিমিন্যালের সঙ্গে সঙ্গে একটা সিভিল্ ড্যামেজের সুট।

হিড়িম্বা : (That's it- That's it) দ্যাটস্ ইট, দ্যাটস্ ইট! বামা কাকা! চক্রান্তে তোমার মত দ্বিতীয় নাই ; ইউ আর এ ডারলিং! You are a darling!

বামা : প্রেয়সি, আমি যখন হিন্দু ছিলেম, দেশে আমায় লোকে ধড়ীবাজ-বামা বল্‌তো। (প্রথম অঙ্ক : তৃতীয় গর্ভাঙ্ক)

হিড়িম্বার ভাবশিষ্য বৌমা কিশোরী। বিদ্যার্জনের দম্ভে সে উদ্ধত এবং হিতাহিত জ্ঞানবর্জিত। নিজেকে উপন্যাসের নায়িকারূপে কল্পনা করতে সে পছন্দ করে। 'ঘরের লক্ষ্মী' সম্বোধন তার নিকট অবমাননাকর। শাশুড়ি তাকে সাংসারিক কাজে দায়িত্বশীল হবার পরামর্শ প্রদান করলে সে যা বলেছে, তাতে উৎকীর্ণ হয়েছে তার চারিত্রিক

বৈশিষ্ট্য – 'নিশ্চয়ই আপনি পাগল হয়েছেন, তা না হলে আমাকে – আর কেউ নয়, আমাকে কেমন করে রান্না-ঘরে গিয়ে উনুনের দিকে চেয়ে থাকতে বল্লেন।' (প্রথম অঙ্ক : পঞ্চম গর্ভাঙ্ক) এতদ্বিষয়ে যুক্তি প্রতিষ্ঠিত করতে সে উত্থাপন করে বাংলা সাহিত্যের কয়েকজন জনপ্রিয় নায়িকার প্রসঙ্গ, যারা কখনও রন্ধন প্রক্রিয়ার সঙ্গে যুক্ত ছিল না। এরা হলো – তিলোত্তমা, মৃণালিনী, ভ্রমর, সূর্য্যমুখী কুন্দনন্দিনী প্রমুখ। সন্তান-ধারণ তার কাছে রুচিহীনতা এবং অসভ্যতা। পিতৃদত্ত নাম কিশোরী পরিত্যাগ করে সে নিজেকে 'উল্লঙ্গিনী' বলে পরিচয় দেয় এবং উচ্ছৃঙ্খল আচরণে লিপ্ত হয়। পরজন্মে সে মশা রূপে জন্মগ্রহণ করে স্বামীর প্রেম-শোণিত পান করতে চায়। তার সখীরাও একইরকম বিকারগ্রস্ত। শেষ দৃশ্যে বাবুরাম গ্রেপ্তার হলে মতিলাল থানায় মামলার বিষয়টি নিষ্পত্তি করতে চায়। কিন্তু একাজে প্রবলভাবে বাধা দেয় কিশোরী এবং তার সখীরা। কেননা তারা নিজেরাই একটি উদ্ভট পরিস্থিতি তৈরি করে বাবুরামকে উদ্ধার করতে চায়। নিতান্ত নাটকীয়ভাবে যখন তারা বিভিন্ন স্বদেশী গান গেয়ে ঘটনামঞ্চে প্রবেশ করে, তখন তা হয়ে ওঠে বিশেষ হাস্যকৌতুকপূর্ণ।

অমৃতলাল বসু বাংলা নাটকের পরিপূর্ণ বিকাশকালের শিল্পী নন। নাট্যকর্মীদের এসময় যথেষ্ট সামাজিক প্রতিবন্ধকতা এবং প্রতিকূলতার মধ্য দিয়ে মঞ্চাভিনয় করতে হতো। নানা পরীক্ষা-নিরীক্ষা এবং নিরন্তর প্রয়াস-প্রচেষ্টার মধ্য দিয়ে তখন এগিয়ে চলছিল বাংলা নাট্যধারা। এজন্য বর্তমান আধুনিক নাটকের মানদণ্ডে হয়তো তাঁর নাটক শিল্পোত্তীর্ণ নয়।[৬] তবে এটি সত্য যে, বর্তমান সময়ে অমৃতলালের ধ্যানধারণা অনগ্রসর ও পশ্চাদগামী হলেও উনবিংশ শতাব্দীর প্রেক্ষাপটে তা নয়। এসময়ে ঈশ্বরগুপ্ত (১৮১২-১৮৫৯), বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় (১৮৩৮-১৮৯৪) কিংবা পরবর্তীকালে শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের (১৮৭৬-১৯৩৮) মতো খ্যাতিমান শিল্পীরাও বিধবা বিবাহ, নারীর স্বাধীনতা এবং ব্রাহ্মধর্মের বিরোধিতা করে সাহিত্যসৃষ্টি করেছেন। তাই বলা যায়, বাংলা নাটকের বিবর্তন এবং কালান্তরের পটভূমিকায় অমৃতলাল বসুর নাট্যপ্রয়াস নিঃসন্দেহে গুরুত্বপূর্ণ।

তথ্যনির্দেশ ও টীকা

১. "১৯০৭ সন হইতে স্টার রঙ্গালয়ের সহিত শ্যামবাজার বঙ্গবিদ্যালয়ও (পরে শ্যামবাজার এ.ভি.) তাঁহাকে পরিচালনা করিতে হইত। শৈশবের শিক্ষানিকেতন শ্যামবাজার বঙ্গবিদ্যালয়ের সহিত তিনি কোনদিনই সংযোগ ছিন্ন করেন নাই। কাশীতে হোমিওপ্যাথি-চর্চার অবকাশে কলিকাতায় আসিয়া অমৃতলাল এখানে অবৈতনিকভাবে শিক্ষকতা করিতেন।... তাঁহার ছাত্র ডাঃ চুনিলাল বসু লিখিয়াছেন– তাঁহার ইংরেজী উচ্চারণ অতি সুন্দর ছিল এবং তিনি যে পাঠ দিতেন, তাহাতে আমরা সবিশেষ লাভবান হইতাম।" (অরুণ ১৯৭০ : ১২৬-১২৭)

২. অসংখ্য প্রহসনের রচয়িতা অমৃতলাল বসু। তাঁর রচিত প্রহসনগুলো হলো : *চোরের উপর বাটপাড়ি* (১৮৭৬), *তিলতর্পণ* (১৮৮১), *ডিসমিশ* (১৮৮৬), *চাটুয্যে ও বাঁড়ুয্যে* (১৮৮৪),

বিবাহবিভ্রাট (১৮৮৪), *তাজ্জব ব্যাপার* (১৮৯০), *রাজা বাহাদুর* (১৮৯২), *কালাপানি বা হিন্দুমতে সমুদ্র যাত্রা* (১৮৯৩), *বাবু* (১৮৯৪), *একাকার* (১৮৯৫), *বৌমা* (১৮৯৭), *গ্রাম্যবিভ্রাট* (১৮৯৮), *সাবাশ আটাশ* (১৯০০), *কৃপণের ধন* (১৯০০), *অবতার* (১৯০১), *সাবাশ বাঙ্গালী* (১৯০৬), *ব্যাপিকা-বিদায়* (১৯২৬), এবং *দ্বন্দ্বে মাতনম্*(১৯২৬)। প্রহসনের পাশাপাশি বেশ কিছু নাটকও রচনা করেছেন তিনি। *তরুবালা* (১৮৯১), *বিমাতা বা বিজয় বসন্ত* (১৮৯৩), *হরিশচন্দ্র* (১৩০৭), *আদর্শ বন্ধু* (১৯০০), *খাসদখল* (১৯১২), *নবযৌবন* (১৯১৪), *যাজ্ঞসেনী* (১৯১৮) তাঁর নাট্যচর্চার উজ্জ্বল নিদর্শন।

৩. 'বিবাহ-বিভ্রাট' নাটক প্রকাশিত হওয়ার পর 'বঙ্গবাসী' পত্রিকার প্রতিষ্ঠাতা যোগেন্দ্রচন্দ্র বসু মন্তব্য করেছিলেন– "বিবাহ বিভ্রাটে'র তুলনা নাই... 'ধারাপাত' 'বর্ণপরিচয়ে'র মত বাঙ্গালীর প্রতি ঘরে ঘরে ইহার অবাধ প্রবেশ থাকা একান্ত আবশ্যক।" 'ভিক্টোরিয়া যুগে বাঙ্গালা সাহিত্য' গ্রন্থে হারাণচন্দ্র রক্ষিত লেখেন– "তাঁহার অদ্বিতীয় প্রহসন 'বিবাহ-বিভ্রাট' সকলের শীর্ষস্থানে। স্বয়ং গিরিশবাবু অথবা তাঁহার পূর্ববর্তী নাটককার দীনবন্ধু– এমনকি মাইকেল পর্যন্ত এ বিষয়ে তাঁহাকে অতিক্রম করিতে পারেন নাই, ইহা আমাদের সরল বিশ্বাস।... বিদ্রূপাত্মক satire-এ তাঁহার যে অদ্ভুত ক্ষমতা পরিদৃষ্ট হয়, এক ইন্দ্রনাথের পঞ্চানন্দ ছাড়া, তেমন শক্তি– তেমন দক্ষতা আর কাহাকেও দেখি না।... সমাজ শরীরে তাঁহার তীব্র-মধুর কশাঘাত এক সময়ে কম কাজ করে নাই।" অন্যদিকে 'ভারতী' পত্রিকায় জনৈক সমালোচক প্রহসনটির প্রশংসায় বলেন– "নীলদর্পণের যাহা মূল্য বিবাহ-বিভ্রাটের মুল্য তদপেক্ষা ন্যূন নহে। তিনি আরও অনেক প্রহসন রচনা করিয়াছেন সেগুলি বিবাহ-বিভ্রাটের সমকক্ষ না হউক মন্দ নহে; আধুনিক 'মুখসর্বস্ব' বাঙ্গালী বীরদিগের নিখুঁত ফটোগ্রাফ। গ্রীসদেশীয় পরিহাস-রসিক Aristophanesএর ন্যায় তাঁহার গ্রন্থাবলী যথেষ্ট শিক্ষাপ্রদ।" (অরুণ ১৯৭০ : ২৪৪-২৪৫)

৪. "স্ত্রী শিক্ষার বিরোধী না হলেও, স্বামী বিবেকানন্দ 'বিলিতি ঢং'-এ মেয়েদের লেখাপড়া শেখানো পছন্দ করতেন না। তিনি মনে করতেন, মেয়েদের লেখাপড়া শেখাতে হবে 'ধর্ম শাস্ত্রানুশাসনে', 'দেশের মতো চালে', 'শিক্ষা ক্ষেত্রে ধর্মকে 'Secondary' করে রাখার ঘোর বিরোধী ছিলেন তিনি। তিনি বলতেন 'মেয়েদের ধর্ম্মপরায়ণ ও নীতিপরায়ণ কত্তে হবে। কালে যাতে তাঁরা ভাল গিন্নি তৈয়িরি হয়, তাই কত্তে হবে।... স্বামীজীর মতো বঙ্কিমচন্দ্রও নীতি নিরপেক্ষ শিক্ষা পদ্ধতির পক্ষপাতী ছিলেন না। *সাম্য* বইতে স্ত্রী শিক্ষা সম্পর্কে সমাজের মনোভাব এবং এর বাধাগুলি তিনি বিশদভাবে আলোচনা করেন। তিনি বলেন– স্ত্রী শিক্ষা বিধেয় কিনা? বোধহয় সকলেই বলিবেন, বিধেয় বটে। তারপর জিজ্ঞাস্য কেন বিধেয়? কেহ বলিবেন না যে, চাকরির জন্য। বোধহয় এতদ্দেশীয় সচরাচর সুশিক্ষিত লোকে উত্তর দিবেন যে স্ত্রীগণের নীতিশিক্ষা, জ্ঞানোপার্জন এবং বুদ্ধি মার্জিত করিবার জন্য, তাহাদিগকে লেখাপড়া শেখানো উচিত।" (স্বপন ২০১৪ : ৩৬৪–৩৬৫)

৫. ড. অজিত কুমার ঘোষের মতে– "ব্যঙ্গ বিদ্রূপের আতিশয্য অমৃতলালের দোষ হইলেও তাহা অপেক্ষা বড় দোষ মাঝে মাঝে দেখা গিয়াছে যেখানে গ্রন্থকার অতি প্রকাশ্যভাবে গ্রন্থের মধ্যে আত্মপ্রকাশ করিয়াছেন। অনেক সময়ে তিনি পাত্রপাত্রীদের মুখে লম্বা বক্তৃতার মধ্য দিয়া সামাজিক দোষ ও অসঙ্গতি বুঝাইবার চেষ্টা করিয়াছেন। হাস্যাত্মক রচনায় এইরূপ জবরদস্তি নিতান্ত দোষাবহ। পরোক্ষ ইঙ্গিতের মধ্য দিয়া আঘাত করিবার অধিকার সাহিত্যিকের আছে, কিন্তু পরোক্ষভাবে প্রচার করিবার দায়িত্ব তিনি নিতে পারেন না, কারণ তাহা হইলে তাঁহার রচনা রসসৃষ্টিবহির্ভূত হইয়া পড়ে।" (অজিত ঘোষ ২০১০ : ১৮৭)

৬. "অমৃতলালের অনেক প্রহসনেই কাহিনীর কোনো জটিল বৈচিত্র্য নাই। দৃশ্য-পরম্পরা যুক্ত করিয়া এবং কয়েকটি পাত্রপাত্রীকে আনিয়া লেখক তাঁহার উদ্দেশ্য ব্যক্ত করিয়াছেন। এই সব প্রহসনে উদ্দেশ্যই মুখ্য, কাহিনী গৌণ। সেজন্য প্রহসন হিসাবে ইহাদের মূল্য বেশী নয়।" (অজিত ঘোষ ২০১০ : ১৮৭) ড. নীলিমা ইব্রাহিম বলেছেন– "পুতুল নাচের চালক যেমন নিজের ইচ্ছা, রুচি ও পরিকল্পনা অনুযায়ী তাদের চালিত করে তেমনি অমৃতলালও তাঁর সৃষ্ট নরনারীকে নির্মম করুণ উপহাসে পাঠক ও দর্শক চিত্তকে ব্যথিত ও ক্ষুব্ধ করেছেন। (নীলিমা ১৩৭৯ : ২২৬) অন্যদিকে *বাংলা সাহিত্যে হাস্যরস* গ্রন্থে অজিত দত্ত বলেছেন– "আজ তাঁর নাটক-প্রহসনাদি পড়লে, কি কারণে বাঙ্গালী তাঁর রচনায় মুগ্ধ হয়েছিল এবং তাঁকে 'রসরাজ' উপাধিতে ভূষিত করেছিল তা সম্পূর্ণ দুর্বোধ্য মনে হয়। অমৃতলালের কল্পনাশক্তি বিন্দুমাত্র ছিল না। তাঁর প্রথম farce যেমন মদুসূদনের অনুকরণ, তেমনি তাঁর অধিকাংশ নাটক-প্রহসনই হয় ইংরেজী, নতুবা অন্য কোনো দেশী-বিদেশী নাটক-প্রহসনের ছায়া অবলম্বন করে রচিত।... অমৃতলালের নট-প্রতিভা যতটাই থাকুক, সাহিত্যিক প্রতিভা কিছুমাত্র ছিল বলে আমি মনে করি না। আধুনিক কালের পাঠক ও দর্শকের পক্ষে শিক্ষাদীক্ষা, রুচি, ভদ্রতা ও শালীনতাবোধ বজায় রেখে অমৃতলালের প্রহসন উপভোগ করা দুঃসাধ্য।" (অজিত দত্ত ২০১৩ : ১৩২-১৩৩)

গ্রন্থপঞ্জি

অজিত কুমার ঘোষ ড. (মে ২০১০)। দ্বিতীয় সংস্করণ, *বাংলা নাটকের ইতিহাস*। দে'জ পাবলিশিং, কলকাতা

অজিত দত্ত (জানুয়ারি ২০১৩)। *বাংলা সাহিত্যে হাস্যরস*। প্রথম প্রকাশ, দে'জ পাবলিশিং, কলকাতা

অমৃত-গ্রন্থাবলী (তৃতীয় ভাগ) (১৩৫৭)। বসুমতী-সাহিত্য-মন্দির, কলিকাতা

অরুণকুমার মিত্র ড. (জানুয়ারি ১৯৭০)। *অমৃতলাল বসুর জীবনী ও সাহিত্য*। প্রথম প্রকাশ, নাভানা, কলকাতা

অরুণকুমার মিত্র ড. (সম্পা.) (জানুয়ারি ১৯৮২)। *অমৃতলাল বসুর স্মৃতি ও আত্মস্মৃতি*। প্রথম মুদ্রণ, সাহিত্যলোক, কলকাতা

অসিতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় (অগ্রহায়ণ ১৩৭৮) *বাংলা সাহিত্যের সম্পূর্ণ ইতিবৃত্ত*। তৃতীয় সংস্করণ, মডার্ণ বুক এজেন্সী প্রাইভেট লিমিটেড, কলকাতা

নীলিমা ইব্রাহিম (ভাদ্র ১৩৭৯)। *বাংলা নাটক : উৎস ও ধারা*। প্রথম সংস্করণ, নওরোজ কিতাবিস্তান, ঢাকা

সুকুমার সেন (আশ্বিন ১৪২১)। *বাঙ্গালা সাহিত্যের ইতিহাস* (তৃতীয় খণ্ড)। দশম মুদ্রণ, আনন্দ পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেড, কলকাতা

সুবোধ চৌধুরী ড. (জানুয়ারি ১৯৯৯)। *সাহিত্য-শিল্প ও নন্দনতত্ত্ব*। প্রথম সংস্করণ, জয়দুর্গা লাইব্রেরি, কলিকাতা

স্বপন বসু, জানুয়ারি (২০১৪)। *বাংলায় নবচেতনার ইতিহাস*, পঞ্চম সংস্করণ, পুস্তক বিপণি, কলকাতা